ড. অজয় রায় ঃ এনজিও বনাম বর্তমান সরকার

*“নারীর ক্ষমতায়ন, নারীর সমঅধিকার, নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সমাজকে সচেতন ও জাগ্রত করার লক্ষ্যে কোনো এনজিও যদি কর্মসূচি গ্রহণ করে, ফতোয়াবাজদের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলে, তাকে কি রাজনৈতিক সম্পৃক্ততাদুষ্ট বলে চিহ্নিত করবো? মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য পাকবাহিনী কর্তৃক নারী নির্যাতনের চিত্র, গণহত্যার কথা এবং রাজাকারদের সহযোগিতার কথা তুলে ধরার জন্য এনজিওর কর্মকাণ্ডকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বলে সরকার চিহ্নিত করতে পারে? কিন্তু বর্তমান খালেদা-নিজামী সরকার এসব কর্মকাণ্ডকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বলে চিহ্নিত করছে। কারণ এই সরকার বহুমাত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বিশ্বাস করে না; ওরা সেক্যুলার উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দর্শনে বিশ্বাস করে না। তাদের রাজনৈতিক দর্শন ইসলামভিত্তিক মনোলিথিক রাষ্ট্রব্যবস্থা।... **সরকারের সঙ্গে এসব এনজিওর বিরোধ মূলত আদর্শিক।** সরকার কিন্তু ইসলামপন্থী যেসব এনজিও নানা কর্মকাণ্ডে লিপ্ত আছে তাদেরকে উৎসাহিত করছে, তাদের বিরুদ্ধে কোনো রাজনৈতিক তৎপরতার অভিযোগ উত্থাপন করেনি।...”*

১

এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বর্তমান সরকার ক্ষমতালাভের পরপরই বেশকিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অলিখিত যুদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং এই যুদ্ধ

ক্রমশ তীব্র আকার ধারণ করেছে। বর্তমান সরকার এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ এনেছে তার সারসংক্ষেপ হলো ঃ

ক. গত নির্বাচনে এবং এর আগেই এসব প্রতিষ্ঠান বর্তমান ঐক্যজোটের বিরুদ্ধে কাজ করেছে, এমনকি বিশেষ কোনো দলের পক্ষে অর্থ জোগানসহ সরাসরি প্রচারে নেমেছিল।

খ. এদের কর্মকর্তারা বিদেশ থেকে দারিদ্র্য বিমোচনের নামে টাকা এনে নিজেদের মাইনে, সুযোগ-সুবিধা যে পরিমাণে বৃদ্ধি করেছে সেই তুলনায় দারিদ্র্য বিমোচন বা উন্নয়ন কর্মসূচিতে ব্যয় করছে না।

গ. অর্থানায়নে ও অর্থব্যয়ে প্রতিষ্ঠানগুলোর আয়-ব্যয়ের স্বচ্ছতা নেই প্রায়শ সরকারকে অন্ধকারে রাখা হয়।

ঘ. এনজিওসমূহের প্রশাসনিক অবকাঠামোতে কোনো গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতিফলন নেই অনেকটা স্বেচ্ছাচারিতামূলক।

ঙ. স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার নামে ও অর্থ উপার্জন প্রক্রিয়ায় উৎসাহদানের নামে দরিদ্র জনগণের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প এসব প্রতিষ্ঠানের একটি বড়ো কর্মসূচি। অভিযোগ এসব ঋণের সুদ উচ্চ হারের এবং ঋণ আদায় প্রক্রিয়া প্রায়শ অমানবিক পর্যায়ে পড়ে।

চ. গ্রামীণ ব্যাংকের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে অনেক প্রতিষ্ঠান বেসরকারিভাবে নিজস্ব ব্যাংকিং পদ্ধতি চালু করেছে যেখানে অর্থ জমা রাখা যায় ও উচ্চ সুদের হারে ঋণ গ্রহণ করা যায়।

ছ. সম্প্রতি সরকার প্রশিকা ও তার প্রধান ড. কাজী ফারুক আহমেদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে যে, আওয়ামী লীগের সরকার পতন আন্দোলনে তিনি সহযোগী শক্তি হিসেবে কাজ করেছেন। কাজী ফারুক আহমেদ প্রশিকাকে এই কাজে ব্যবহার করেছেন।

বিএনপির মহাসচিব এবং স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী আবদুল মান্নান ভুঁইয়া স্বয়ং এই অভিযোগ এনেছেন একটি সংবাদ সম্মেলনে প্রকাশ্যভাবে। এখন প্রশ্ন হলো, বর্তমান সরকার ও এনজিওদের মধ্যে সম্পর্ক কেন তিক্ততম পর্যায়ে উন্নীত হলো? এনজিওদের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ উত্থিত হয়েছে তার ভিত্তি ও

সত্যতা কতোটুকু? সত্যিই কি অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো বিরোধী পক্ষীয় রাজনৈতিক দলগুলোকে অর্থ জোগান দিচ্ছে? এরা কি নিজেদের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য অসামঞ্জস্য হারে অর্থ ব্যয় করছে, যাদের জন্য অর্থ আনা হচ্ছে সেই দুর্গত মানুষদের জন্য অর্থ ব্যয়ের তুলনায়?

যেসব প্রতিষ্ঠান স্থানীয় গচ্ছিতকারীদের কাছ থেকে সংগৃহীত অর্থ যেভাবে তাদের কর্মসূচির জন্য খরচ করছে তা কি অনুমোদনযোগ্য বিশেষ করে জাতীয় ব্যাংকিং ব্যবস্থায় প্রচলিত আইনের দৃষ্টিতে? যে উচ্চহারে সুদের বিনিময়ে ঋণদান করা হচ্ছে তা কি উপকৃত ব্যক্তিদের ওপর উচ্চ বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছে না? দাতাগোষ্ঠীর প্রেরিত অর্থের সঙ্গে যদি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-সম্পৃক্ততা থাকে অথবা সরকার যদি কোনো অর্থ জোগানকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে চিহ্নিত করে তাহলে এ অর্থের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত কিনা?

এসব প্রশ্নের সুষ্ঠু উত্তর বা সমাধান না মেলা পর্যন্ত এনজিও-সরকার সম্পর্ক তিক্ত থেকে তিক্ততর হতে বাধ্য। অবশ্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো সবসময় বলে আসছে যেকোনো দলীয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার দর্শনে তারা বিশ্বাসী নয় এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এর কোনো সুযোগও নেই। কিন্তু জীবন তো রাজনীতি থেকে বিচ্যুত নয়। প্রায় সব বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মূল অভিলক্ষ্য হলো দরিদ্র ও বঞ্চিত সাধারণ মানুষ। সুতরাং এদের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য যেসব কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় বা এদের অধিকার সচেতন ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে যেসব সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়, যার মধ্য দিয়ে দরিদ্র ও বঞ্চিত মানুষরা নিজেরাই তাদের ভাগ্য উন্নয়নে কিছু স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে প্রয়াস পাবে সেই সব কর্মকাণ্ডে রাজনীতি ও তার তাৎপর্য সম্পৃক্ত হতে বাধ্য। কতিপয় উদাহরণ দেওয়া যাক, রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম হলেও বাংলাদেশ বহির্বিশ্বে এখনো পরিচিত একটি সেক্যুলার গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে। এখন যদি কোনো এনজিও এই চেতনাবোধকে সাধারণ মানুষদের মধ্যে গভীরভাবে প্রোথিত করার লক্ষ্যে কর্মসূচি গ্রহণ করে নাটক মঞ্চায়ন, গ্রামসভা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে তাহলে কি ঐ প্রতিষ্ঠানটিকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত বলে চিহ্নিত করা যায়? নারীর ক্ষমতায়ন, নারীর সমঅধিকার, নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সমাজকে সচেতন ও জাগ্রত করার লক্ষ্যে কোনো এনজিও যদি কর্মসূচি গ্রহণ করে, ফতোয়াবাজদের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলে, তাকে কি রাজনৈতিক সম্পৃক্ততাদুষ্ট বলে চিহ্নিত করবো? মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য পাকবাহিনী কর্তৃক নারী নির্যাতনের চিত্র, গণহত্যার কথা এবং রাজাকারদের সহযোগিতার কথা তুলে ধরার জন্য এনজিওর কর্মকাণ্ডকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বলে সরকার চিহ্নিত করতে পারে? কিন্তু বর্তমান খালেদা-নিজামী সরকার এসব কর্মকাণ্ডকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বলে চিহ্নিত করছে। কারণ এই সরকার বহুমাত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্র

ব্যবস্থায় বিশ্বাস করে না; ওরা সেক্যুলার উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দর্শনে বিশ্বাস করে না। তাদের রাজনৈতিক দর্শন ইসলামভিত্তিক মনোলিথিক রাষ্ট্রব্যবস্থা। বর্তমান সরকার নারীর ক্ষমতায়ন ও নারী-পুরুষের সমঅধিকারে বিশ্বাসী নয়, শুধু সেটুকু ক্ষমতায়ন ও নারী অধিকার দিতে চায় যতোটুকু তাদের ব্যাখ্যা মতে ইসলাম অনুমোদন দিয়েছে। এরা ফতোয়াবাজে শুধু বিশ্বাসী নয়, বরং এটিকে সমাজ ও ধর্ম অনুমোদিত ব্যবস্থা বলে বিশ্বাস করে। তাই নির্দ্বিধায় বলা যায় যেসব এনজিও ধর্মনিরপেক্ষতায়, বহুমাত্রিকতায়, উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায়, নারীর ক্ষমতায়ন ও নারী-পুরুষের সমঅধিকার, মুক্তিযুদ্ধের দর্শন-আদর্শ-চেতনায় বিশ্বাস করে কর্মকাণ্ড পরিচালিত করে, তারা এই সরকারের এবং মৌলবাদীদের শত্রু বলে চিহ্নিত হবে, আর তাদের বিরুদ্ধে সরকার নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা নেবে, এতে আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কিছু নেই। উল্লিখিত অভিযোগগুলোর মধ্যে এনজিওগুলোর রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা বিষয়টি সরকারের কাছে সবচেয়ে স্পর্শকাতর। সরকারের দৃষ্টিতে যেসব এনজিও উপরে বর্ণিত আদর্শসমূহ নিয়ে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে তারাই মূল বিরোধী দল এবং অন্যান্য বাম ও উদারনৈতিক দলগুলোর সহযোগী হিসেবে সরকারবিরোধী আন্দোলনে শরিক হয়েছে। সরকারের ভয় এসব এনজিওর রয়েছে বিপুলসংখ্যক উপকারপ্রাপ্ত জন ও উল্লেখযোগ্যসংখ্যক মানুষ এদের ঋণগ্রাহী। সরকারের এই অভিযোগ এক অর্থে সত্য, অন্যদিকে আবার নয়। আদর্শগতভাবে এসব এনজিওদের কর্মসূচি অবশ্যই বর্তমান সরকারের পক্ষে যায় না এবং বিরোধী দল ও উদার রাজনৈতিক আদর্শের কাছাকাছি। পাশাপাশি এটিও সত্য যে, এনজিওদের কর্মকাণ্ড কখনো বিপ্লবাত্মক নয়, শুধু সচেতনমূলক। কারণ এরা বিপ্লবী সংস্থা নয়, রাজনৈতিক দলও নয়, রাজনৈতিক ক্ষমতা গ্রহণ বা নির্বাচনে অংশগ্রহণ ইত্যাদি এদের কর্মসূচিতে পড়ে না। সুতরাং সরকারের সঙ্গে এসব এনজিওর বিরোধ মূলত আদর্শিক। সরকার কিন্তু ইসলামপন্থী যেসব এনজিও নানা কর্মকাণ্ডে লিপ্ত আছে তাদেরকে উৎসাহিত করছে, তাদের বিরুদ্ধে কোনো রাজনৈতিক তৎপরতার অভিযোগ উত্থাপন করেনি। কারণ এসব ইসলামি সংস্থাগুলো সরকারের রাজনৈতিক আদর্শের সঙ্গে ঐকমত্য।

এ প্রসঙ্গে আমরা প্রশিকার কথা আলোচনায় আনতে চাই। বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আওয়ামী লীগের সঙ্গে সরকার উৎখাতের আন্দোলনে প্রশিকার সংশ্লিষ্টতা নিয়ে যে গুরুতর অভিযোগ এনেছেন প্রশিকা প্রধান ড. কাজী ফারুক আহমেদ তা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছেন। ড. আহমেদ একে সর্বৈব মিথ্যা বলে মান্নান ভুঁইয়াকে তা তথ্য-প্রমাণাদি সহযোগে স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠা করার আহ্বান জানিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে ড. আহমেদ যে প্রেসবিজ্ঞপ্তি দিয়েছেন এতে প্রশিকার আদর্শের কথা স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন ঃ

'প্রশিকা মুক্তি যুদ্ধের চেতনা বিকাশ, দারিদ্র্য বিমোচন ও নারীর ক্ষমতায়ন এবং অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধ প্রসারে সফলভাবে কাজ করে চলেছে। কিন্তু জোট সরকারের অধিকাংশ নেতার অবস্থান স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধবিরোধী এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতি তাদের মজ্জাগত। তাই দারিদ্র্য বিমোচন ও নারীর ক্ষমতায়ন এবং অসাম্প্রদায়িকতা ও মুক্তিযুদ্ধের কথা শুনলে তাদের গায়ে ফোসকা পড়ে। এ কারণে তারা প্রশিকার প্রগতিশীল ভূমিকার জন্য সরাসরি অভিযোগ করতে না পেরে জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য আওয়ামী লীগের সঙ্গে আঁতাতের কাল্পনিক গল্প রচনা করেছে।'

প্রশিকাসহ মুক্তমনের আদর্শে বিশ্বাসী সংগঠনগুলোর বিরুদ্ধে সরকার যে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে এর পেছনে রয়েছে মূলত রাজনৈতিক ও আদর্শগত কারণ। সরকার কয়েকটি ফ্রন্টে যুদ্ধ পরিচালনা করছে ঃ

প্রথমত, সরকার এনজিও ব্যুরোর মাধ্যম বেশকিছু এনজিওর চলমান এবং নতুন কর্মসূচির জন্য অর্থ অবমুক্তি বিলম্বিত করছে অথবা ইতিমধ্যে বাতিল করে দিয়েছে। দ্বিতীয়ত, ব্যুরো প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর আয়কর ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগ তুলে নানাভাবে হয়রানি করছে। এছাড়া বিদেশাগত অর্থের অপচয় করা হয়েছে বলে অভিযোগ আনা হয়েছে, যদিও এখন পর্যন্ত ব্যুরো তা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। এই বাধা বিপত্তি ও হয়রানির কারণে কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম এমনকি কর্মচারীদের বেতন প্রদানেও সমস্যা দেখা দিয়েছে। এর ফলে সরকারের অনেক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড যে ব্যাহত হচ্ছে এতে কোনো সন্দেহ নেই। সরকারের কর্মকাণ্ড দেখে মনে হচ্ছে তারা বিদ্রোহী এনজিওদের হাত ভেঙে দেওয়ার কাজে লিপ্ত, অন্যদিকে আবার তাদের প্রয়োজনীয়তাও বার বার স্বীকার করা হচ্ছে সরকারের পক্ষ থেকে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে বর্তমান সরকার উভয় সংকটে পড়েছে তারা দ্বৈত-মানসিকতা রোগে আক্রান্ত। একদিকে ধারাবাহিকভাবে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলোতে জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে এনজিওদের অংশগ্রহণের ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে, অন্যদিকে সরকার এনজিওদের কর্মকাণ্ডকে সরকারের নিয়ন্ত্রণে ও তত্ত্বাবধানে আনার জন্য নানা ধরনের নিষেধাজ্ঞামূলক ও তত্ত্বাবধানী আইন জারি করে চলেছেন। এর ফলে এনজিওদের স্বাধীন কর্মসূচি প্রণয়নে ও তা মসৃণভাবে বাস্তবায়নে জটিলতা দেখা দিয়েছে, উন্নয়ন প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে। সরকার স্বল্পোন্নত দেশগুলোর উন্নয়ন সংক্রান্ত ইউনেস্কো সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তটিকে পুঁজি করে এই নিবর্তনমূলক আইনসমূহ জারি করে চলেছে। উক্ত সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে

’বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ জাতীয় আইন ও বিধানমালা মেনে চলবে। সকল শ্রেণীর নাগরিকদের ভাগ্যোন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় সরকার কর্তৃক গৃহীত কৌশলাদি, অগ্রাধিকারসমূহ এবং নীতিমালাসমূহকে সমর্থন করে এনজিওসমূহ যাতে তাদের কর্মসূচি ও প্রকল্পসমূহ প্রণয়ন করে সেই লক্ষ্যকে উৎসাহিত করা হবে।’ এই সিদ্ধান্ত থেকে সরকার মনে করে যে, এনজিওসমূহ তাদের প্রণীত তথাকথিত জাতীয় প্রকল্পসমূহ ও কর্মসূচির বাস্তবায়নে সহযোগী সমর্থক শক্তি হিসেবে কাজ করবে সরকারের এজেন্ট হিসেবে বি টিম রূপে। কিন্তু দুর্ভাগ্য হলো সরকার নিজেই তার কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করেছে যে, তাদের প্রকল্প বাস্তবায়নে তাদের কাছে যথাযোগ্য কৃৎ কৌশলগত বিশেষত্ব ও দক্ষতা নেই; সরকারকে এনজিওদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়। এর ফলে সরকারই বি টিমে পরিণত হয় ব্যবহারিক ক্ষেত্রে। কিন্তু সরকারের হাতে রয়েছে রাষ্ট্রক্ষমতা এবং দলীয় দাপট। এর ফলে সরকার চায় এনজিওদের তাদের দ্বিতীয় ফ্রন্ট হিসেবে পেতে বশংবদরূপে, চায় তাদের ওপর রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে। এই সৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই বেয়াড়া এনজিওসমূহকে বশে ও নিয়ন্ত্রণে আনার লক্ষ্যে ক্রমাগত আইন প্রণয়ন ও বিধি-নিষেধ আরোপ করে চলেছে। কিন্তু সরকার ভুলে যাচ্ছে যে, এনজিও দর্শনের মূলভিত্তিই হলো স্বায়ত্তশাসন ও সরকার অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা, তাদের কর্মসূচি প্রণয়নের নীতিনির্ধারণে, প্রয়োগে ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায়।

প্রথমেই আমরা সরকার কর্তৃক এনজিওদের ওপর আর্থিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতে চাই। গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্পের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে বেশকিছু এনজিও এক ধরনের ব্যাংকিং প্রথা চালু করেছে এবং এই ব্যবস্থা ক্রমশ বিস্তৃতি লাভ করেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে এনজিও প্রবর্তিত বেসরকারি ব্যাংকিং প্রথা তথা ক্ষুদ্র-অর্থনীতিক কর্মতৎপরতার ওপর খবরদারি করার লক্ষ্যে অর্থনীতি বিষয়ক ক্যাবিনেট কমিটি একটি দু’বছর মেয়াদি অস্থায়ী নিয়ন্ত্রক সংস্থা গঠনের প্রস্তাব দিয়েছে যার প্রধান হবেন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর। অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ক্যাবিনেট কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, স্বীকৃত ব্যাংক ছাড়া অন্য কোনো সংস্থা জনসাধারণের কাছ থেকে টাকা গচ্ছিত রাখতে পারবে না। এটির অনুমোদন দিলে অর্থমন্ত্রীর ভাষায় তা ক্ষুদ্র-অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর প্রভাব ফেলবে। অর্থমন্ত্রী অবশ্য বিশদভাবে বলেননি, এটি কীভাবে প্রভাবিত করবে। গ্রামীণ ব্যাংককে যদি এই তৎপরতা চালাতে অনুমোদন দেওয়া হয় তাহলে অন্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে এ তৎপরতা থেকে বঞ্চিত করা হবে কেন? ক্যাবিনেট কমিটি Committee on Microfinance Research and Reframe Unit (SCMRU)কে নিয়ন্ত্রণ সংস্থা হিসেবে কাজ করতে নির্দেশ দিয়েছে– এতে অর্থমন্ত্রীর বিশবাস মতে, সব ধরনের ক্ষুদ্র-অর্থনৈতিক সংস্থার ঋণ সংক্রান্- যাবতীয় তথ্যের একটি তথ্য ভাণ্ডার (Data base) গড়ে তুলতে সহায়ক হবে। এই গবেষণা সেলের তথ্য অনুযায়ী এ যাবৎ ক্ষুদ্র-অর্থনৈতিক

প্রতিষ্ঠানগুলো এবং এই সেক্টরে কর্তব্যরত এনজিও সংস্থাসমূহের গচ্ছিত টাকার অঙ্ক ১ কোটিরও অধিক। যেহেতু কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই গচ্ছিত টাকা সম্পর্কে কোনো খবর রাখে না বা এই প্রক্রিয়াকে নিবারণ করার কোনো পদ্ধতি ব্যাংকের নেই, তাই বিষয়টি উদ্বেগজনক। আরো উৎকণ্ঠার বিষয় হলো ৪০০ কোটি টাকারও বেশি অর্থ ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউট অ্যাক্টের ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলারের পরিপ্রেক্ষিত লিজ দান করা ও গৃহনির্মাণ কোম্পানিসমূহ জনসাধারণের কাছ থেকে গচ্ছিত রেখেছে। এছাড়া বিভিন্ন সমবায় সংস্থাসমূহ অজ্ঞাত পরিমাণ অর্থ সাধারণ মানুষের কাছ থেকে গচ্ছিত রেখেছে। এনজিওসহ ক্ষুদ্র-অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের (Microfinance Institutions) ওপর জনগণের টাকা গচ্ছিত রাখার বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপের যথার্থতার সমর্থনে অর্থমন্ত্রী প্রশ্ন তুলেছেন, 'What is the use of banks if they (non-bankers) can mobilize funds'। এই নিষেধাজ্ঞা জারির সরাসরি ফল হলো এনজিও বা ক্ষুদ্র অর্থনৈতিক এককসমূহ জাতীয় ব্যাংকিং প্রথার সমান্-রালে একটি ছদ্মবেশী ব্যাংকিং ব্যবস্থা (pseudo banking system) চালু করতে পারবে না। এই প্রস্-াবিত নিয়ন্ত্রণের ফলে অনেক এনজিওদের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাধাগ্রস্- এবং প্রকল্প বাস্-বায়ন ব্যাহত হবে, কারণ অনেক, বিশেষ করে স্থানীয় অর্থনির্ভর বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের অর্থায়নের একটি বড়ো উৎস হলো এই ছদ্মবেশী ব্যাংকিং পদ্ধতি। এখন প্রশ্ন হলো, সরকার কি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সহায়তা ছাড়াই একাকভাবে দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি বাস্-বায়নে সমর্থ? যদি সমর্থ হয়, তাহলে এনজিওসমূহের অস্-িতেবর কোনো প্রয়োজন নেই এবং তাদেরকে সরকারের পক্ষ থেকে বলা উচিত ঃ (ক) নিজেদের অস্-িতব লোপ করতে এবং (খ) দাতাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ দাতাদের কাছে ফেরত দিতে অথবা সরকারের কাছে হস্-ান্-র করা (যদি অবশ্য দাতারা রাজি হন)। কিন্তু এ ধরনের পদক্ষেপ নিতে দাতাগোষ্ঠী প্রদত্ত ডলারনির্ভর প্রণীত অর্থনীতিনির্ভর বাংলাদেশ সরকার কখনো পারবে না, আমাদের বাকচতুর অর্থমন্ত্রী এনজিওদের ওপর বাইরে থেকে যতোই ছড়ি ঘোরান আর যতোই দাবি করুন যে, তদীয় গৃহীত অর্থনৈতিক পদক্ষেপসমূহ দাতাদের ওপর আমাদের অর্থনির্ভরতা অনেকাংশে কমিয়ে এনেছে। অবশ্য বাস্-বে এর কোনো প্রতিফলন নেই। অন্-ত আমাদের মতো সাধারণ মানুষের কাছে। এর পেছনে যে কারণগুলো বিদ্যমান তা নিম্নরূপ ঃ

ক. সরকার নিজে আত্মপ্রত্যয়ী নয় এবং বাংলাদেশের অর্থনীতি এমন মজবুত নয় যে দাতাগোষ্ঠীর অর্থ জোগান ব্যতীত এরা চলতে পারবে। এর প্রতিফলন ঘটেছে বাংলাদেশের পঞ্চবার্ষিকীর প্রতিবেদনগুলোতে। দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বিশেষ করে দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে এনজিওসমূহের গুরুতবপূর্ণ ভূমিকার কথা জোর দিয়ে বলা হয়েছে। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, গত কয়েক দশক ধরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কলাকৌশল দাতাগোষ্ঠী ও বিশবব্যাংকের উপদেশে ও নির্দেশে এমনভাবে

নির্মিত হয়েছে যে, এনজিওসমূহ বর্তমানে আমাদের অর্থনৈতিক ও বিবিধ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে একটি অনস্বীকার্য উপাদান হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে যাকে ইচ্ছা করলেই ঝেটিয়ে বিদায় করা যায় না।

খ. উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও অর্থনৈতিক প্রকল্পসমূহ বাস্-বায়নে এমনকি বাস্-বায়নযোগ্য কর্মসূচি প্রণয়নে সরকারি অবকাঠামো বেশ দুর্বল এবং বিশেষজ্ঞসুলভ জ্ঞান ও দক্ষতার অভাব স্পষ্ট। পাশাপাশি রয়েছে দুর্নীতি ও শৈথিল্য। তুলনায় এনজিওসমূহ তাদের কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে যে, তাদের দক্ষতা, সততা, নিপুণতা, আন্-রিকতা ও বিশেষজ্ঞসুলভ জ্ঞান একটি প্রামাণ্য স্-রে (Standard level) রয়েছে এবং তাদের গৃহীত প্রকল্পবাস্-বায়ন কর্মসূচিসমূহ অনেক বেশি বাস্-বসুম্মত (pragmatic)। সরকারও এর স্বীকৃতি দিয়েছে। ফলে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ বিশেষ করে অর্থনৈতিকভাবে দৃঢ় যেমন গ্রামীণ ব্যাংক, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র, ব্র্যাক, প্রশিকার মতো সংস্থাসমূহ মনে করে যে তারা সরকারি সংস্থাগুলোর (government agencies) তুলনায় অনেক দক্ষ, সুশৃঙ্খল ও উচ্চমান-ব্যবস্থাপনাসম্মত। এর ফলে এ সংস্থাসমূহ অনেক বেশি সাংগঠনিকভাবে মজবুত ও স্বাধীনচেতা ও আচার-আচারণে সরকার-অনপেক্ষ। এদের প্রত্যেকটি সংগঠনের রয়েছে আদর্শিক ভিত ও দর্শন যা কেবল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও দারিদ্র্য বিমোচনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

যেমন প্রশিকার ক্ষেত্রে এরা নারী অধিকার ও ক্ষমতায়ন, জনগণের অর্থনৈতিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার, সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সঞ্চারী কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। এ ধরনের কর্মকাণ্ড ব্র্যাকও এক সময় গ্রহণ করেছিল (যদিও পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে অনেকটা আত্মরক্ষার তাগিদে কমিয়ে দিয়েছে) যার জন্য নানা স্থানে তাদের ওপর মৌলবাদীদের অত্যাচারের খাঁড়া নেমে এসেছিল। ব্র্যাকের বর্তমান কর্মকর্তাদের নিশ্চয় তা মনে আছে। আর এখানেই এসব এনজিওদের সঙ্গে সরকারের ও মৌলবাদীদের সঙ্ঘাত দেখা দিয়েছে। সরকারের ব্যাখ্যা মতে এনজিওদের এ ধরনের কার্যক্রম রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে পড়ে ও বিরোধীদলীয় রাজনৈতিক দলসমূহের পক্ষে যায়। অন্যদিকে মৌলবাদীদের বক্তব্য হলো নাছারা ইহুদিবাদী এনজিওদের এসব কর্মকতৎপরতা ইসলামবিরোধী, যা তারা প্রাণ দিয়ে হলেও রুখবে।

সুতরাং সরকারের অপছন্দনীয় এনজিওদের শত্রু হলো সরকার এবং চারদলীয় জোটের মৌলবাদী সংগঠনসমূহ।

গ. সরকারের দুর্নীতিগ্রস্ত শিথিল অবকাঠামোর কারণে দাতাগোষ্ঠী সরকারের কাছে সরাসরি অর্থ প্রেরণের পরিবর্তে এনজিওদের মাধ্যমে অর্থ প্রেরণ অধিকতর পছন্দ করে। এটি সরকারের জন্য বেশ বিব্রতকর, আর এ কারণেই সরকার এনজিও ব্যুরোর মাধ্যমে এনজিওদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করতে চায় শক্ত হাতে নিত্যনতুন আইন প্রণয়ন করে, যার মূল লক্ষ্য হলো বিদ্রোহী, বেয়াড়া ও স্বাধীনচেতা এনজিওদের সরাসরি নিজ নিয়ন্ত্রণে আনা, এককথায় বশংবদ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা। শুধু এনজিওদের ক্ষেত্রে নয়,

> সরকারের মনোবৃত্তি হলো সকল ধরনের স্বাধীন, অর্ধস্বাধীন, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের ওপর সকল স্তরে পছন্দমতো নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা তা প্রেসিডেন্সি থেকে শুরু করে বাংলা একাডেমী পর্যন্ত বিস্তৃত।

এক কথায় সরকার 'স্বায়ত্তশাসন ও স্বশাসন' দর্শনে বিশ্বাসী নয়। সরকারের দর্শন হলো বিচার ব্যবস্থা, কর্মকমিশন, নির্বাচন কমিশন থেকে বিশ্ববিদ্যালয় সর্বক্ষেত্রেই তার নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা ও অক্ষুণ্ন রাখা।

২

বস্তুত সরকার কি চায়? সরকার কি চায় তা কিন্তু অস্পষ্ট রাখেনি, তা বাঞ্ছনীয় কি না তা স্বতন্ত্র প্রশ্ন। সরকারের মনোভাব হলো দাতাগোষ্ঠী যদি এনজিওদের মারফত অর্থ প্রেরণ ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে চায় এতে সরকারের আপত্তি নেই, অবশ্য যদি ঐ সংস্থাগুলো সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকে। এক কথায়, সরকার চায় যে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনায় ও সরকারি কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরকারের বি-টিম হিসেবে কাজ করুক। বস্তুত এখানেই সরকারের সঙ্গে স্বাধীনচেতা এনজিওদের দ্বন্দ্বের উৎস নিহিত। আমাদের মধ্যে অনেক তথাকথিত বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ মানুষ আছেন যারা সরকারের এই মনোবৃত্তির সঙ্গে একমত এরা বলেন যে, এনজিওরা তাদের বিশেষজ্ঞসুলভ জ্ঞান ও দক্ষতা দিয়ে সরকারের কাজে সহায়তা করুক, কিন্তু সরকারি নিয়ন্ত্রণে ও দেশের প্রচলিত আইনের আওতায় থেকে। এ ধরনের

মতাবলম্বীদের সংখ্যা কিন্তু কম নয়, যারা সমস্যাটির অভ্যন্তরে না গিয়ে ওপর থেকে দেখেন। সম্প্রতি আমি এ ধরনের জনৈক বিশেষজ্ঞের একটি টিপিকাল মতামত নিচে তুলে ধরছি নমুনা সদৃশ ঃ

"The Government in permitting NGOs to work for alleviating poverty did the right thing because they cannot run the development process alone. But recently there have been signs that NGOs view themselves as better than government agencies and thought they will remain in the sphere of fixing the rate of interest on loans lent to the poor, they cannot continue to act as if they are independent to the extent they do not have to follow the law of the land. However, this is not to say that Bangladesh does not need the services of NGOs, these NGOs must be honest in their endevour. And above all, they must stay out of politics. It should also not be forgotten that many of the donors are responsible for this situation as they made no attempt to hide their distrust of government agencies and have consistently shown a preferance to channel funds through NGOs directly, which any government worth its salt would find objectionable."

একটি চমৎকার জ্ঞানগর্ভ মহৎ উপদেশ (sermon) নিঃসন্দেহে। এনজিওসমূহ কিন্তু কখনো বলেনি যে তারা দেশের বা আন্-র্জাতিক আইনের উর্ধ্বে বা স্বীকার করেনি যে তারা দেশের প্রচলিত আইন ভঙ্গ করেছে। তারা প্রতিবাদ জানিয়েছে সরকার যেসব নিবর্তন-নিয়ন্ত্রণমূলক আইন প্রবর্তন করেছে বা করতে চায় সে সবের বিরুদ্ধে। এনজিওদের বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ উত্থিত হয়েছে, বিশেষ করে ব্যবসায়ী মহল থেকে, যে বিদেশ থেকে অর্থ এনে এসব বেরসকারি প্রতিষ্ঠান দেশের আইন ভঙ্গ করে ব্যবসা চালাচ্ছে এবং তারা কোনো সুদ, শুল্ক বা আয়কর প্রদান করছে না। অর্থমন্ত্রী নিজেও এ প্রসঙ্গে সিলেটি বাংলা-ইংরেজি ককটেলীয় তার চমৎকার বাকশৈলীতে অনেকবার এ কথা বলেছেন। এরা যদি ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়ে থাকে তাহলে সরকারের চোখের সামনেই, দেশের প্রচলিত আইনের আওতায় করছে এবং সরকারের বড়ো কর্তাদের অনুমোদন নিয়েই। এরা যদি বেআইনিভাবে ব্যবসায় লিপ্ত হয় এবং শুল্ক বা আয়কর ফাঁকি দিয়ে থাকে তাহলে প্রচলিত আইনেই এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে এবং শুল্ক বা আয়কর আদায় করতে অসুবিধা কোথায়? উদাহরণস্বরূপ ব্র্যাক যে ব্যাংক, বিশববিদ্যালয় ইত্যাদি স্থাপন এবং কৃষিজাত বিভিন্ন সামগ্রী উৎপাদনের প্রকল্প বা অন্য কোনো ব্যবসায়িক উদ্যোগ চালু করেছে তা কি সরকারের বিনা অনুমতিতে? ড. ইউনূসের গ্রামীণ ব্যাংক প্রথা (ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান ও ডিপোজিট গ্রহণ) যদি উৎসাহিত করা হয় ও আইনসিদ্ধ প্রথা হয়ে থাকে, তাহলে অন্যান্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতি তো হুংকার ছাড়ার কোনো প্রয়োজন নেই। এবং আমাদের উদ্দেশে তাত্ত্বিক প্রশ্ন 'What

is the use of banks if they (non bankers) can mobilize funds' ছুড়ে মারার কোনো অর্থ হয় না। এই প্রথাকে যথাযথ আইনের আওতায় নিয়ে এলেই তো হয়, যদি তা দরিদ্র জনস্বার্থে প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে স্থানীয় ক্ষুদ্র-মাঝারি বেসরকারি সংস্থাগুলো বিশেষ উপকৃত হবে। প্রশ্ন হলো, এই প্রথা (ড. ইউনূসের গ্রামীণ ব্যাংকিং প্রথাসহ) সাত্যিকার অর্থে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারীদের দারিদ্র্য বিমোচনে ও তাদের গৃহীত উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্-বায়নে কার্যকর ভূমিকা রাখছে কিনা?

সরকারের স্বেচ্ছাচারী ও একনায়কসুলভ মনোভঙ্গির সারসংক্ষেপ হলো
ক. সরকার চায় যে এনজিওগুলো তাদের বিপুল অর্থ-সম্পদ এবং বিশেষজ্ঞসুলভ জ্ঞান ও দক্ষতা অবকাঠামো নিয়ে অস্-িতব বজায় রাখুক, তবে সরকারের বশংবদ হয়ে সরকারি কঠোর নিয়ন্ত্রণে থেকে সরকার গৃহীত কর্মকাণ্ড ও কর্মসূচিতে বি-টিম হিসেবে কাজ করুক। প্রশ্ন হলো প্রশিকার কথা বাদ দিলেও, গ্রামীণ ব্যাংক, ব্র্যাক, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের মতো সংস্থাগুলো তা মেনে নেবে? মেনে নেবে কি মৌলবাদী এনজিওগুলো?

সরকার অবশ্য চায় না বিদ্রোহী এনজিওদের কার্যক্রম বন্ধ করে দিতে, তারা চায় অবকাঠামোতে প্রশাসনিক রদবদল ঘটিয়ে প্রশাসনিক ও নীতিনির্ধারণী পদগুলো দখল করা। এ জন্য সরকারের চাপ, নাটকীয় এবং নারকীয় পরিবেশ সৃষ্টি, পুলিশি জোর জুলুম, ভেতর থেকে বিদ্রোহ ও অভ্যুত্থান ঘটানো। সম্প্রতি প্রশিকার বিরুদ্ধে সরকারি, পুলিশি ব্যবস্থা-হয়রানি ও দলীয় ক্যাডারদের তাণ্ডব কার্যক্রম এই নীতির সাম্প্রতিকতম উদাহরণ

খ. সরকার অবশ্য চায় না বিদ্রোহী এনজিওদের কার্যক্রম বন্ধ করে দিতে, তারা চায় অবকাঠামোতে প্রশাসনিক রদবদল ঘটিয়ে প্রশাসনিক ও নীতিনির্ধারণী পদগুলো দখল করা। এ জন্য সরকারের চাপ, নাটকীয় এবং নারকীয় পরিবেশ সৃষ্টি, পুলিশি জোর জুলুম, ভেতর থেকে বিদ্রোহ ও অভ্যুত্থান ঘটানো। সম্প্রতি প্রশিকার বিরুদ্ধে সরকারি, পুলিশি ব্যবস্থা-হয়রানি ও দলীয় ক্যাডারদের তাণ্ডব কার্যক্রম এই নীতির সাম্প্রতিকতম উদাহরণ। সরকার এখন প্রশিকার রেজিস্ট্রি বাতিলের দাবি তোলাচ্ছে না, দাবি তোলাচ্ছে ড. কাজী ফারুক আহমদের অপসারণ, উদ্দেশ্য পরিষ্কার প্রশিকার প্রশাসনিক শীর্ষ পদগুলো দখল এবং প্রশিকাকে বিএনপির অঙ্গসংগঠনে পরিণত করা।

গ. বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে, বিশেষ করে স্বাধীনচেতা ও বিদ্রোহী এনজিগুলোকে

বশ্যতায় আনার উদ্দেশে 'নিয়ন্ত্রণ ও নিবর্তনমূলক' আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সরকার সম্প্রতি।

এনজিও সম্পর্কিত সাম্প্রতিক আইনসমূহের প্রকৃতি ১৯৭৮ সালে গৃহীত বিদেশী অনুদান সম্পর্কিত নিয়ন্ত্রণ অর্ডিন্যান্সটির সংশোধনের উদ্যোগ সম্প্রতি সরকার নিয়েছে। মুখে মহৎ উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছে যে এতে সরকারের সঙ্গে এনজিওদের একটি সুসম্পর্ক স্থাপিত হবে। কিন্তু আসল উদ্দেশ্য এই সংশোধনীর মাধ্যমে সরকার চায় বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা। যেমন, সংশোধনী বিলের ২ নং অনুচ্ছেদের উপঅনুচ্ছেদ (জি) তে বলা হচ্ছে : "political activity' includes any activity which may be interpreted as political, or may affect politics, or such other activities which may be interpreted to be detrimental to national independence, sovereignity, culture, ethnic and religious sentiment" এনজিওদের তথাকথিত রাজনৈতিক কার্যক্রম বন্ধ করার উদ্দেশ্যে 'political activity' বা 'রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার' যে ব্যাপক সংজ্ঞা ও আওতা নির্ধারণ করা হয়েছে তা কী ভয়ঙ্কর। যেমন, detrimental to national independence নাম করে যেকোনো কর্মসূচিকে এর আওতায় ফেলে যে প্রতিষ্ঠানটিকে 'শাস্- দিতে চাই' সে প্রতিষ্ঠানটির ওপর সরকার চড়াও হতে পারে। অথচ 'জাতীয় স্বাধীনতার প্রতি হুমকিস্বরূপ' অর্থাৎ বাক্যাংশটির কোনো সুচারু ও সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি।

*এই বিধানটি এতোই ব্যাপক ও নমনীয় (**flexible**) যে সরকার বা চারদলীয় জোটের কোনো শরিক, কোনো এনজিওর বিশেষ করে মানবাধিকার সম্পৃক্ত এনজিওদের কোনো কর্মসূচি অপছন্দ করলে বা এর কোনো কর্মতৎপরতা সরকারি নীতির সমালোচনামূলক হলে তাকে শায়েস্-া করার জন্য এই আইন প্রয়োগ করতে পারে। অথবা ফতোয়াবিরোধী বা নারীর ক্ষমতায়ন সম্পর্কিত কোনো প্রোগ্রাম গ্রহণ করা হলে মৌলবাদীরা যদি এই প্রোগ্রামকে ইসলামবিরোধী আখ্যা দেয় তাহলে এই এনজিওর বিরুদ্ধে এই আইন প্রয়োগ করে শাস্- দিতে পারে সরকার।*

এককথায় রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমতব বিরোধী চক্রান্-, ধর্মীয়, জাতিগত ও সাংস্কৃতিক অনুভূতির ওপর আঘাত ইত্যাকার ধুয়ো তুলে সরকার ইচ্ছামতো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে কোনো বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে। সরকারের স্বেচ্ছাচারিতা ও ফ্যাসিবাদী মনোভাবের এক চমৎকার প্রকাশ। এই বিলে আনীত অন্যান্য সংশোধনীতেও সরকারের এই দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠেছে। যেমন ৬ নং অনুচ্ছেদের ৪ নং উপঅনুচ্ছেদে সরকার যেকোনো বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ প্রধানকে, তার বিরুদ্ধে অনিয়ম ও অপশাসনের অভিযোগ এনে, পদচ্যুত করার নির্লজ্জ ক্ষমতা অধিগ্রহণ করেছে। সেখানে বলা হচ্ছে ঃ যদি সরকার “is satisfied that the Chief Executive of an organization has been responsible for any irregularity in respect of its funds or for any mal-administration in the conduct of its affairs, or has caused the organization to be involved in any political activity, or any activity influencing politics directly”– তাহলে ঐ প্রধান নির্বাহীকে অপসারণ করা যেতে পারে।

> *এ ধরনের ধারা সংযোজিত হলে সরকারের ওপর যে ক্ষমতা অর্পিত হবে সেই ক্ষমতার জোরে, সন্দেহ নেই, সরকার ইচ্ছা মতো এনজিওসমূহের কার্যক্রমে হস্-ক্ষেপ করতে পারবে এবং যেকোনো এনজিওকে বিলুপ্ত করে তার অর্থসম্পদ* **(assets)** *আত্মসাৎ* **(iquidation)** *করতে পারে। সরকারকে এ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে বিলটির ৬ ও ৩–ম অনুচ্ছেদে। ২ নং অনুচ্ছেদের ব, ভ উপঅনুচ্ছেদে* ***irregularity I mal-administration–*** *এর যে নতুন সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তা রীতিমতো ভীতিপ্রদ। সরকারের উদ্দেশ্য বুঝতে একটি বালকেরও অসুবিধা হয় না। বেয়াড়া ও মানবাধিকার কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এনজিওসমূহই হলো সরকারের লক্ষ্য* **(target)***। এই বেয়াড়াদের তালিকার শীর্ষে ‘প্রশিকা’।*

সম্প্রতি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি ছোট ৮টি এনজিওকে দুর্নীতির অভিযোগে কালো তালিকাভুক্ত করেছে। এবং শাস্-িমূলক ব্যবস্থা হিসেবে

এদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় কিস্-ির বরাদ্দ অর্থ স্থগিত রাখা হয়েছে। এসব এনজিও স্থানীয় স্-রের এবং অতি ক্ষুদ্র। এরা সকলেই সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। এ ধরনের প্রায় ৩৫০টি ক্ষুদ্র-মাঝারি এনজিও এ কাজে নিয়োজিত, আর এদের প্রায় প্রত্যেকের বিরুদ্ধে রয়েছে দুর্নীতির অভিযোগ। সরকারের এই নিবর্তনমূলক আইনসমূহ মানাবাধিকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ওপর প্রভাব পড়বে এবং মানবাধিকার লজ্ঞনের প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে। এ ধরনের আইন প্রণয়ন মানবাধিকার রক্ষায় নিয়োজিত সংস্থা ও ব্যক্তিস্বাধীনতা সম্পর্কিত জাতিসংঘ ঘোষণার পরিপন্থী (সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ১৯৯৮ সালের ৯ ডিসেম্বরে গৃহীত), যেখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে ঃ

"the right, individually and in association with others, to submit to governmental bodies and agencies and organizations concerned with public affairs criticism and proposals for improving their functioning and draw attention to any aspect of their work that may hinder or impede the promotion, protection and realization of human rights and fundamental freedoms." (Article 8, Para 2).

এ ধরনের আইন প্রণয়ন সরকারের অস্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গির বহির্প্রকাশ ও বেসরকারি স্বাধীন সংস্থাগুলোর ওপর কর্তৃতব প্রদর্শন ও নিয়ন্ত্রণ অভিলাসী মনোভাবের পরিচায়ক। কিন্থ সরকার বুঝতে চায় না যে, স্বাধীন ও মুক্ত চিন্-ার অধিকারী এবং প্রাণবন্- নাগরিক সমাজের উপস্থিতি গণতন্ত্রের জন্য এবং স্বচ্ছ ও সুস্থায়ী অব্যাহত উন্নয়ন প্রক্রিয়ার জন্য অপরিহার্য। স্বাধীন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহকে কঠোর সরকারি নিয়ন্ত্রণের রজ্জুতে বেঁধে কেবল নামে বেসরকারি সংস্থায় পরিণত করলে গণতন্ত্রায়ন, সমাজের দুর্বল শ্রেণীর ক্ষমতায়ন ও সার্বিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ব্যাহত হবে।

মানবাধিকার সংস্থাসমূহের প্রতিক্রিয়া বেসরকারি সংস্থাসমূহের ওপর চারদলীয় সরকারের এই নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টা শুধু এনজিওদের মধ্যে ভীতিজনক প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়নি, দেশের সুধী সমাজও এর বিরুদ্ধে সরকারের তীব্র সমালোচনা করেছে। দাতাগোষ্ঠীর মধ্যেও কতিপয় মানবাধিকার সংগঠনে সমালোচনামুখর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে আমরা উল্লেখ করতে পারি যে, ঋওউঐ ও ঙগঈঞ নামের দুটি মানবাধিকার সংস্থার উদ্যোগে গঠিত 'The Observatory for the Protection of Human Rights Defenders' নামের এই যুক্ত কর্মসূচিতে বাংলাদেশ সরকারের প্রস্-াবিত 'Amendment Bill to the Foreign Donations (Voluntary Activities) Regulations Ordinance (1978)' বিলটি সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। FIDH-এর সভাপতি সিদিকি কাবা ও OMCT-এর পরিচালক এরিক সোত্তাস বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার উদ্দেশে লেখা একটি উন্মুক্ত চিঠিতে এই

সংশোধনী বিল আনার প্রস্-াবে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন যে, বিলটি বেসরকারি সংস্থার জন্য একটি “serious threat to the independence of NGOs most notably of human rights NGOs”| তাদের আরো মন্-ব্য হলো যে, সরকারের এই প্রস্-াব হচ্ছে, “an attampt to place NGOs under strict political control”। চিঠিতে, এনজিওদের রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কে এক ধরনের প্রশাসনিক পদ্ধতি থাকা উচিত– এ নীতির সঙ্গে একমত হয়েও প্রস্-াবিত আইনের বিরোধিতা করে পর্যবেক্ষক সংস্থাটি (observatory) মন্-ব্য করেছে যে এই সংশোধনী ‘বাক-স্বাধীনতা ও সংঘ বা সমিতি করার স্বাধীনতাকে’ স্-ব্ধ করে দেবে। আর “unfortunately, this seems to be hidden purpose of the Ammended bill” বলে তারা চিঠিতে মন্-ব্য করেছেন। নেতৃবৃন্দ আরো অভিযোগ করেছেন যে, বিলটি তৈরির প্রক্রিয়ায় যথাযথ স্বচ্ছতা অবলম্বন করা হয়নি এবং বাংলাদেশের বৃহৎ, বিশেষ করে মানবাধিকার সচেতন এনজিওদের সঙ্গে অর্থবহ আলোচনা করা হয়নি, যদিও এ জাতীয় সংস্থাসমূহই এই সংশোধনী বিল দ্বারা মুখ্যত আক্রান্- হবে।
এ প্রসঙ্গে 'South Asian News-Feature Service' মন্-ব্য করেছে যে পর্যবেক্ষক সংস্থাটি (observatory) বিশবাস করে যে, “the dangers of having a government regulate the internal affairs of NGO's far outweigh the problems caused by dysfunctional organization. In effect, such a provision would simply annihilate at its core the independence of NGOs” [South Asian News- Feature Service, April 26, 2004] পর্যবেক্ষক সংস্থাটির (observatory) দৃঢ় বিশবাস যে, সরকারের এ ধরনের পদক্ষেপ মানবাধিকার রক্ষাকারীদের ওপর জাতিসংঘ ঘোষণার ('UN Declaration on Human Rights Defenders') ১ ও ৩ নং দফার (Articles) পরিপন্থী। ১ নং দফায় বলা হয়েছে ঃ

Everyone has the right, individually and in association with others, to promote and to strive for the protection and realization of human rights and fundamental freedoms at the national and international levels.'

মানবাধিকার সংস্থা দুটির নেতৃদ্বয় মনে করেন যে, সংশোধনী বিলের বক্তব্য ‘বাক-স্বাধীনতা ও একত্রিত হওয়ার স্বাধীনতার’ (Freedoms of expression and association) সীমাকে লঙ্ঘন করেছে, যা কিনা ওঈঈচজ-এর ১৯ (৩) ও ২২ (২) দফায় সুনিশ্চিত করা হয়েছে। প্রস্-াবিত বিলে উল্লিখিত 'political activity', 'detrimental to national independence', 'detrimental to religious sentiment' ইত্যাকার পদ ও বাক্যাংশ সরকার যদৃচ্ছামতো যেকোনো এনজিওর

বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারে বলে নেতৃদ্বয় চিঠিতে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। কারণ এসব পদ বা বাক্যাংশের সুনির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞা বিলটিতে প্রদান করা হয়নি।

দাতাগোষ্ঠীর প্রতিক্রিয়া

গত ৭ মে (২০০৪) জনপ্রিয় আওয়ামী লীগ নেতা ও সাংসদ আহসানউল্লাহ মাস্টারের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পটভূমিতেই শুরু হয়েছিল দাতাগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের সঙ্গে বাংলাদেশের উন্নয়ন ফোরামের বৈঠক ০৮-০৫-০৪ তারিখে। সাংসদ আহসানুল্লাহ মাস্টারের নিহত হওয়ার ঘটনা দাতাদের সামনে উন্মোচন করলো বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি কী? এর জন্য কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপনের প্রয়োজন হল না। উন্নয়ন ফোরাম দাতাদের যেসব প্রশ্নের ও সরকারি কাজের তীক্ষ্ণ সমালোচনার মুখে পড়েছিল তা হলো ঃ আইনশৃঙ্খলা, দুর্নীতি ও সরকারের স্বচ্ছতা, সুশাসনের অভাব, মানবাধিকার লঙ্ঘন ও কালো আইনের অপপ্রয়োগ (৫৪ ও ১৬৭ ধারা), বিরোধী দলের ওপর নির্যাতন, সরকার-এনজিও তিক্ত সম্পর্ক ও নিয়ন্ত্রণের নামে এনজিওর বিরুদ্ধে নিবর্তনমূলক আইন প্রবর্তন ইত্যাদি। এছাড়া সরকারের অর্থনৈতিক ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড। যতোদূর জানা গেছে, দুদিনব্যাপী এই বৈঠকে মোট ৭টি অধিবেশন হয়। দাতাগোষ্ঠীর পক্ষে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বিশ্বব্যাংকের দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রফুল্ল চন্দর প্যাটেল ও আইএমএফ-এর এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের উপদেষ্টা নিসানকে বীরসিংহ। সরকারের পক্ষে বক্তব্য রাখার জন্য উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রীবর্গ ও আমলারা। যতোদূর জানা গেছে, এনজিওদের কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণের নামে সরকার যে এসব সংগঠনের বিরুদ্ধে নিবর্তনমূলক আইন প্রবর্তন করার উদ্যোগ নিয়েছে এতে দাতাগোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা কঠোর অবস্থান নিয়েছেন। এর ফলে সম্মেলনের পরদিনই স্থানীয় প্রশাসন ও গ্রামীণ উন্নয়নমন্ত্রী মান্নান ভুঁইয়া সাংবাদিকদের জানান যে, এনজিও সম্পর্কিত প্রস্তাবিত বিলটি আপাতত স্থগিত রেখে পরে এনজিওদের সঙ্গে আলোচনা করে নতুন বিল আনা হবে। কিন্তু উন্নয়ন ফোরামের বৈঠক শেষ হওয়ার পরই সরকার স্বমূর্তিতে আবির্ভূত হন এবং বিদ্রোহী এনজিওদের শায়েস্তা করার লক্ষ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। প্রশিকার সভাপতি ও এডাবের চেয়ারম্যান ড. কাজী ফারুক আহমেদ ও সহসভাপতি ডেভিড উলিয়াম বিশ্বাসসহ বেশ কতিপয় কর্মকর্তাকে গ্রেপ্তার ও নির্যাতন সরকারের প্রতিশোধমূলক প্রত্যয়ের সাম্প্রতিকতম উদাহরণ।

(সমাপ্ত)

ড. অজয় রায় ঃ বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ। **মুক্ত-মনা সদস্য।**

নিবন্ধটি ভোরের কাগজে ২ পর্বে প্রকাশিত (৪, ৫ জুন, ২০০৪) এবং লেখকের অনুমতিক্রমে মুক্ত-মনায় পুনঃ প্রকাশিত।